সংবাদ 665
তারিখ 27.6.83
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

# পরীক্ষা নামের লটারি

—জাগরী

জাগ্রত-চেতনা অদৃষ্টবাদিতার বিপক্ষে। ভাগ্যকে আপন হাতে গড়ে তোলার দীক্ষা আমাদের। 'কপাল' বলে কিছুর স্বীকৃতি সভ্যতার অভিধানে নেই। কর্মের এ ভুবনে একমাত্র কর্মেরই জয়—সভ্যতার সংজ্ঞাটিই এই। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে এ তত্ত্বের কোনও মিল নেই। এখানে কেতাবের কথা আর মুখের উচ্চারণের সঙ্গে কাজ কারবারের দুস্তর ব্যবধান। আর সব ব্যাপারের মতোন প্রচলিত পরীক্ষার বিধি-রীতি-ই এর বড় প্রমাণ।

আমাদের এখানে 'পরীক্ষা' জিনিসটি ছেলে-বুড়ো সকলের কাছেই বিভীষিকা। বিভীষিকার অন্তরালে কাজ করছে অনিশ্চয়তা। অনিশ্চয়তা বোধটা। এজন্যেই দেখা যায়, পরীক্ষা শুরু হওয়ার দিনে সার্বিকভাবে যে বিষণ্ন পরিবেশ তৈরী হয়, তাতে কম্পিত হয় একইভাবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের হৃদয়। এ উদ্বেগাকুলতা পুরো তিনটি মাস পর্যন্ত কুরে কুরে খায় এবং চরমে পৌছায় যখন ফল প্রকাশের দিনটি কাছাকাছি হয়। অবিশ্বাস্যভাবে মানসিক অস্থিরতা বেড়ে যায়। কেবলি মনে হয়—কি হয়, কি হয়।

ভেতরের চিন্তা বাইরের ক্রিয়াকে পরিচালিত করে। উদভ্রান্ত পরীক্ষার্থী ও তার অভিভাবক সংশ্লিষ্টদের কাছে বিপন্নমুখে দৌড়ায়। শেষ মুহূর্তের এ উৎকণ্ঠা তুলনাবিহীন। নানান ধরনের গুজব রটে হাওয়ায় হাওয়ায়। বেপথু শিক্ষার্থীরা গিয়ে ভিড় করে বোর্ডের দোরগোড়ায়। লৌহ-বেষ্টনী ভেদ করে বাঁধমছুট হয়ে ভেতরে ঢুকতে চায়। প্রহরীর প্রতিরোধ তার কাছে মর্মান্তিক মনে হয়। অতি তরুণ শিক্ষার্থীদের এমন শ্রান্ত, ক্লান্ত, দিকভ্রান্ত চেহারার বর্ণনা ভাষায় দেয়ার নয়।

কোমলমতি বাচচাদের কেন এই টেনসন? কেন এমন করে তাদের ভিখারীর মতোন অনুকম্পা-প্রার্থী হতে হয়? এর জবাব একটিই। পরীক্ষার ফলাফলের অনির্ধারিত চেহারা। পরীক্ষা ভালো দিলেই হয় না। নম্বর পেতে হলে আরও কিছু লাগে। পরীক্ষকের মন, মান, মর্জি। এ তিনটি জিনিসের ওপরই প্রচলিত সাবজেকটিভ পরীক্ষায় মূল্যায়িত উত্তরপত্রের মূল্যমান বিশেষভাবে নির্ভর করে। এছাড়া আরও আছে। খাতাপত্রের নিরুদ্দেশ গমনও কম আতঙ্কের নয়। তখন আবার গড়পড়তা নম্বরের আওতায় পড়তে হয়। এতো সব প্রতিবন্ধকতা কাটানোর জন্য যা দরকার তা হচ্ছে ললাট লিখন। পরীক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসের যে বিনাশ ঘটেছে এ হচেছ তার একমাত্র কারণ। তার অনভিজ্ঞ জীবনে প্রথম পাবলিক পরীক্ষাই এমন করে বয়ে আনে তার জন্য সেরা বিপর্যয়। সব মিলিয়ে মাত্র চৌদ্দ বছর উত্তীর্ণ এক একজন এস এস সি পরীক্ষার্থী জীবনের মোক্ষম দর্শনটি হাতের মুঠোয় পেয়ে যায়। দর্শনটি হচেছ কেষ্ট পেতে হলে কষ্ট করলে চলে না, এজন্য অদৃষ্টেরও জোর থাকতে হয়।

বলা হয়, উৎস নয়, উদ্দেশ্যই বড়। তারও চেয়ে বড় হচ্ছে প্রয়োগ তত্ত্বের বা নীতিমালার প্রায়োগিক দিক। এর অভাবেই নাকি পুরো ব্যাপারটি মার খেয়ে যায়। এই পরীক্ষাকে সামনে রেখেই এ কথাটি আর একবার উচচারণ করা যায়। পরীক্ষা শিক্ষার্থীর মাননির্ণয়ের একমাত্র মাধ্যম এবং পরীক্ষার নির্ধারিত মানই জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের একমাত্র পথ। মেধার যাচাই হয় 'পরীক্ষা' নামের মাপকযন্ত্র দিয়ে--পরীক্ষা সর্বতোভাবে জীবনের ছাপই এঁকে দেয়। প্রতিভার স্বীকৃতির আর কোনও পদ্ধতি বা পন্থা এখানে নেই। পরীক্ষার গুরুত্বটি এমন হয়েছে এ জন্যই।

অথচ এই পরীক্ষাই আজ বিরাট প্রশ্ন। শিক্ষা জীবনে এ যেন দারুণ বিড়ম্বনার। এ হপ্তায় দেশের চারটি শিক্ষাবর্ষের ফলাফল পাওয়া গেছে। মোট ২৭০৫৭৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ১২২৩৩৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। পাস হয়নি ১৪৮২৩৭ জন পরীক্ষার্থী। অংশ হিসেবে ধরলে বেশীর অংশটিই ব্যর্থ। এই ব্যর্থতা কার? পরীক্ষার্থীর যে পরিবার--অবশ্যই তার। এক একটি ছেলে বা মেয়েকে এস, এস, সি পর্যন্ত টেনে নিতে যে আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে হয়, তাতে প্রতীয়মান হবে, এ ব্যর্থতা কেবল আশাহতের বেদনাই বয়ে আনে না, অনুশোচনার গ্লানিও মাত্র না, এ ছুড়ে ফেলে এক অসহায় অন্ধকার আবর্তে, মানসিক, বৈষয়িক ও আর্থিক এ বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা দেশ-কালের নিক্তিতে চাট্টিখানি কথা নয় মোটেও। তবু কাটিয়ে উঠতে হয়। তবু কাটানো যায়--আর সব পিছু হটিয়ে কেবল ভাগ্যটাকে সামনে এনে দাঁড় করালেই হয়।

হ্যাঁ পরীক্ষা এখানে ভাগ্যই। ভাগ্য--কারণ এখানে সমস্যা ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করানো, আরও সমস্যা ভালো স্কুলে ভর্তি করানো; সমস্যা আছে পাঠ উপকরণ যোগাড়পাতি করায়। সমস্যা আছে রীতিমত অন্নবস্ত্র যোগান দিয়ে নিরাপদে বাড়ি-স্কুলে আনা-নেয়ায়। এ সবের জন্য ভাগ্যের প্রভাব দরকার হয়। ভাগ্যের আনুকূল্য প্রয়োজন হয় 'একান্ত শিক্ষক' রাখার প্রশ্নেও—এমনকি এই 'একান্ত শিক্ষকের' যশ, নামও ছাত্রের ভাগ্য।

কাজেই বর্ণপরিচয় থেকে আরম্ভ করে পরীক্ষা অবধি পৌছানোর যে সড়ক, তার কোনও অংশেই সদিচ্ছা বা সৎকর্মের স্থান নেই। পরীক্ষা প্রতিযোগিতা, সন্দেহ নেই—কিন্তু এ সমাজে এ প্রতিযোগিতা অভিভাবকের অবস্থার। ছাত্রের মেধার চাইতেও বাবার-অর্থ ক্ষমতারই অধিক জয়-জয়কার।

প্রসঙ্গটি অপ্রিয়। তবু রেখে-ঢেকে বলায় যদি ফায়দা না হয়, তো খোলাখুলি বলাই ভালো। একটি সহজ কথা তোলা যায়--পরীক্ষাকে এমন করে জুজুবুড়ী কেন মনে হয়? এর জবাব কঠিন নয়। এজন্য পরীক্ষাকে নেপথ্যে নিয়ে গিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ার দিকে যেতে হয়। অবশ্য এর বিস্তারিত কাসুন্দি নিয়ে খই ফোটানোর স্থান এটা নয়। 'উপনিবেশী' শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বৃটিশদের বহু ধিক্কার দেয়া হয়েছে। 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে পাকিস্তানীদেরও বিস্তর উপহাস করা হয়েছে। কিন্তু তাতে কোন লাভটা আর হয়েছে? যে দীনতা ছিল বৃটিশদের দু'শ বছরের জীর্ণতার, যে হীনতা ছিল পাকিস্তান আমলের সিকি শতাব্দীর শিশুপনায়, তারই প্রতিফলন রয়ে গেছে বাংলাদেশের এক যুগের ধ্যানধারণায়। বরং শাসন-শোষণের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে আগের সময়ের বিধানে বৈপরীত্য আবিষ্কার করা যায় না--কিন্তু স্বাধীন দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কেন আজকের শিক্ষা ব্যবস্থাটা ঠিক এঁটে উঠছে না, এটাই সকলের দুর্ভাবনা।

এসব ভাবনা নিয়ে কথা কম হয়নি---আন্দোলনও কম হয়নি। কোনও কালেই কানে এসব বাদ-প্রতিবাদ মধু বর্ষণ করেনি, ফলে বক্তা ও উদ্যোক্তাদের ভাগ্যে জুটেছে হয়রানি। বহু হৃদয়ের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গেছে, বহু 'দিবস' জন্ম নিয়েছে--কিন্তু ফলাফল যে কে সেই রয়ে গেছে। রয়েও ঠিক যায়নি। বরঞ্চ অবস্থা আরও করুণতর-ই হয়েছে।

কমিশন কমিটির নির্ণীত প্রস্তাবাবলী আলোর মুখ কদাচিৎ দেখেছে। মুহূর্ত, ঘণ্টা, দিন ব্যয়ে যেসব প্রস্তাবের হিমালয় গড়ে উঠেছে, তা গেছে হয় হিমাগারে, নয় পোকার পেটে। সবই উত্তম, সবই অভ্রান্ত, এমন দাবী করেনি কেউ, করা যায়ও না। কিন্তু শুরু না হলে ভ্রান্তি ঘুচে ক্রান্তিকাল অতিক্রমের কী সম্ভাবনা? ফলে যা ঘটার ঘটছে।

আগের কাল থেকে পরের কাল শিক্ষা-দীক্ষায় নিম্নগামী হচ্ছে। অতীতের শিক্ষার দাম বাড়ছে। পুরনো তেঁতুল আর পুরনো আমসত্ত্বের মতো কদর বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রাচীনকালের শিক্ষিতদের।

অথচ যুগ, কাল, সভ্যতা, প্রগতি সবকিছুরই দাবীতে এর বিপরীতটা আশা করা গেছে। আধুনিক শিক্ষাসূচী আধুনিকতার নামে অভিনব হয়ে উঠছে। লক্ষ্যণীয়—সদ্য প্রবর্তিত নবম শ্রেণীর কোর্স কেবল শিরঃপীড়ার নয়, অন্ত্রপীড়ারও কারণ হয়েছে। কচি শিক্ষার্থীর মধ্যে হালের সর্বজ্ঞান সম্পৃক্ত করার নামে যে ব্যাপক ও জটিল বিষয়ভার চাপানো হয়েছে, তার ফলে পুস্তকের অবয়ব রীতিমত আভিধানিক হয়ে উঠেছে। নম্বরের মান কমিয়ে বিষয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে পুরো ব্যাপারটি জগাখিচুড়ি করে তোলা হয়েছে। কিন্তু এসব বই পাঠদান করবেন যাঁরা, তাঁদের যোগ্যতা রাতারাতি কোথা থেকে ভাড়া করা হবে, সে বিষয়টি উহ্য রয়ে গেছে।

এমনিতেই শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের মান একটি প্রশ্ন। এটা সত্য, সকল প্রতিষ্ঠানে সকল শিক্ষকরা এক ষ্ট্যাণ্ডার্ডের নন। সত্য বটে, তবে অনাকাঙ্ক্ষিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংকট এজন্য দায়ী মুখ্যত:। সাধারণভাবে শিক্ষকেরা, বিশেষভাবে স্কুল-পর্যায়ের শিক্ষকেরা, সর্বাধিক অবহেলিত। এ অবহেলা অর্থের, অতএব মর্যাদার। মর্যাদা ভারী মজার ব্যাপার, এ ফানুস নয়, এ খামোকা পাওয়া যায় না, বিশেষ করে ত্যাগ, তিতিক্ষা, নিষ্ঠা, এমনি এ্যাবসট্রাক্ট ব্যাপারে এ ধরা দেয় না --এজন্য কনক্রিট ভিত চাই। এ ভিতটা হচ্ছে কড়ির।

এজন্য বিশেষ কোনও প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে দোষ দেয়া যায় না। কান টানলে মাথা আসে, তাই বলতে হয় আসল হচ্ছে পরিকল্পনা। পরিকল্পনায় শিক্ষার প্রাধান্যটা। জনসংখ্যাসূচীতে অকাতরে অর্থ ব্যয় হয়, এমনকি অভিজাত এলাকার রাস্তায় দ্যুতিময় পাথর-কুচি ছড়ানোতেও কুণ্ঠা নেই, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে টাকার জন্যই অগাধ ভাবনা। শিল্পে ভর্তুকি চলে, অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই ভর্তুকি চলে—শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তুকি চলে না। শিক্ষাটা যে এতো বড়ো সুদূরপ্রসারী ইনভেস্টমেণ্ট, আজ অবধি তা সংশ্লিষ্টদের হৃদয়ঙ্গম হলো না। ফলে শিক্ষাটা আজও ব্যক্তি পর্যায়ের মাথাব্যথা। এ কারণেই যার ঘরে ভাত আছে, তার ঘরে শিক্ষা আছে, যার নেই, তার কিছুই নেই। তবু দুর্মূল্যের দিনে যাবতীয় খাই-খরচা বাদ দিয়ে যারা শিক্ষার জন্য কঁকিয়ে মরছে, আরও মূল্য তাদেরই গুনতে হচ্ছে। যেমন মান, তেমন শিক্ষা পাচ্ছে।

এটাই সবচে' আমাদের শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য, উল্লেখযোগ্য যেহেতু দুর্ভাগ্যজনক দিক। এ দিকটা হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য। দেশের নাগরিক হলেই যেমন শিক্ষালাভের অধিকার নেই, তেমনি শিক্ষা পেতে চাইলেই সমমানের শিক্ষালাভের অধিকার সকলের নেই। গাঁয়ে-গঞ্জের শিক্ষা-বিনাশ যথার্থই 'ফলপ্রসূ' হয়েছে, এখন নির্বিঘ্নে বলা চলে শহরবাসীর ছেলেরাই বোর্ডের যাবতীয় প্লেসগুলো পাবে। শহরেও কিছুসংখ্যক বিদ্যালয়কে বিশেষভাবে তেলেজলে এমনভাবে লালন করা হচেছ যে, স্বাভাবিকভাবেই বাকীগুলো নিঃস্ব হয়ে থাকবে। অথচ পরীক্ষা নামক রণাঙ্গনে এক কাতারে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। পুরো ব্যাপারটি-ই লেজে-গোবরের এবং নিদারুণ পরিতাপের।

পাস হলেই চলবে না। পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই উত্তম ফলাফল করতে হবে। তৃতীয় মান পেলেই 'ঠেলে দেবে নীচে ফেলে।' জগৎজীবন জাহান্নামে যাবে। কিন্তু মান সংরক্ষণ বা উন্নয়নের ব্যবস্থাটি কি, তার সম্পর্কে নিঃসীম নীরবতা সর্বক্ষেত্রে।

তাই পরীক্ষার্থীমাত্রই কেবল পাস নয়। ভাল মান চায়। কেবল জানা নেই তার এ প্রাপ্তির পথটি কি বা সেই সুড়ঙ্গটি কোথায়। পরীক্ষায় ভালো করা কি স্বপ্নে প্রাপ্ত টনিকের ফল? এ জন্য কি বিশেষ ধরনের কবচের প্রয়োজন? নাকি এ জন্য চাই চার আঙুলের কপালে কোনও জল জলে লিখন?

এসব যদি নাই হয়, তবে পরীক্ষা লটারী নিশ্চয়ই। কচি শিক্ষার্থীদের এমন সহজ প্রশ্নের সরল জবাবটি আর দেয়া যাচ্ছে কই; তার ব্যর্থতার জন্য যখন সে কেঁদে বুক ভাসায় কিংবা নিরুপায় অভিভাবকের হাতে নিদারুণ লাঞ্ছিত হয় অথবা আপন হাতে আত্মঘাতী হয়, তখন তা দুঃসহ চপেটাঘাত তুল্যই মনে হয়। এ চপেটাঘাত পরীক্ষার্থীর ভাগ্যের ওপর নয়, গোটা সমাজ ও পুরো সমাজ ব্যবস্থার ওপরই বর্তায়।